দায়মুক্তি

ফ্ল্যাটের পিছন দিকে এক ফালি ন্যাড়া ছাদ। এদিকটায় কেউ আসে না সচরাচর, আশী নম্বরের দাদু ছাড়া। হ্যাঁ, এ পাড়ায় আশী নম্বরের দাদু নামেই সিতেশবাবুকে চেনে সবাই। সবাই মানে আশেপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ও পাড়ার যত কাজের লোকেরা। ওই ন্যাড়া ছাদটুকুই বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁর একমাত্র যোগসূত্র।

সিতেশবাবুর একমাত্র পুত্র অরিন্দম ফ্লোরিডায় আছে আজ বিশ বছরের উপর। আমেরিকার নাগরিক সপরিবারে। গোড়ার দিকে দু'এক বছর অন্তর দেশে আসতো বাবা-মা'র কাছে। সিতেশবাবুর স্ত্রী গত হয়েছেন আজ বারো বছর। সিতেশবাবু চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন তারও দশ বছর হতে চললো। এতকাল দিল্লীতে বাংলো বাড়িতে ছিলেন। স্ত্রী গত হবার পর এবং চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরও সেখানেই কাটিয়েছেন পুরানো পরিবেশে।

চার বছর আগে হঠাৎ একটা স্ট্রোক হয়ে তদবধি পঙ্গু হয়ে আছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শিবনাথের সঙ্গে থাকেন এখন। অরিন্দমই নাকি এ ব্যবস্থা করে গেছে সবদিক বিবেচনা করে। সিতেশবাবু মোটা পেন্সন পান। আর্থিক দিক থেকে তিনি পরনির্ভর নন। তবে তাঁর পক্ষে একা থাকা আর সম্ভব নয়। শিবনাথ ও তার স্ত্রী বন্দনার হাতে তাঁর ভার দিয়ে অরিন্দম নিশ্চিন্ত। বিদেশ থেকে টেলিফোনে বাবার খোঁজ খবর নেয় নিয়মিত। হয়তো প্রয়োজন পড়লে টাকাকড়িও পাঠায়। সবদিক থেকে ভেবে দেখলে বর্তমান পরিস্থিতিতে সিতেশবাবু ভালই আছেন বলা চলে। অন্তত বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেবার থেকে অনেক শ্রেয় অবস্থায় আছেন।

বাড়িতে শিবনাথ ও তার স্ত্রী বন্দনা। ওদের একমাত্র সন্তান সুজাতা স্বামীর সঙ্গে জাকার্তায় থাকে। দু'এক বছর অন্তর অল্প কিছুদিনের জন্যে আসে। শ্বশুর বাড়ি ও বাপের বাড়ি ভাগাভাগি করে থাকে ছুটির ক'টা দিন। বন্দনা স্কুলে চাকরি করে। বাড়ির কাজের জন্যে ঠিকে ঝি আছে। সিতেশবাবুর দেখাশোনার জন্যে তাকেই বলা আছে। আশে পাশে আরও গোটা চারেক বাড়িতে কাজ করে

মেয়েটি। বাঁধা সময়ে এসে সিতেশবাবুর কাজগুলো করে দিয়ে যায়।

আশী নম্বর ফ্ল্যাটে কোত্থাও রোদ্দুর আসে না, পিছনের ওই ন্যাড়া ছাদটুকু ছাড়া। ঠিকে ঝি লছমীকে বলা আছে বন্দনার। এগারোটার সময় সিতেশবাবুকে হুইলচেয়ার সুদ্ধু রোদে বসিয়ে দিয়ে যায়। আবার একটার সময় ঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে দেয়। এরপর ঘরেই থাকেন সিতেশবাবু। ছাদেও আর রোদ থাকে না তখন।

ন্যাড়া ছাদের বাঁদিকটায় বসলে নীচের রাস্তা দেখা যায়। লোকজনের আসা যাওয়া, ঠেলাগাড়ি নিয়ে হকারের হাঁকাহাকি, স্কুলের বাসে বাচ্চাদের ওঠানামা ----। নানারকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তাই বাঁদিকটাতেই বসতে ভালবাসেন সিতেশবাবু। কিন্তু এক এক দিন লছমী তাড়াহুড়ো করে সিতেশবাবুর হুইলচেয়ারটা অন্যদিকে দেয়ালের পাশে রেখে তড়িঘড়ি কেটে পড়ে। সিতেশবাবু ডাকাডাকি করলে না শোনার ভান করে। শুনতে পেলেও গা করে না। হেসে বলে, "বুঢ়া দাদু কি বকছে বোঝাই যায় না।"

এই কথাটা অন্যদেরও বলতে শুনেছেন সিতেশবাবু। ওঁর কথা নাকি বোঝা যায় না। যত্ত সব বুজরুকি। আসলে না বোঝার ভান করলে কাজটা আর করতে হয় না। আগে বন্দনার কাছেনালিশ করতেন। এখন আর করেন না। নালিশ করে লাভ নেই কোনও। বন্দনা পছন্দ করে না। মধ্যে থেকে যার নামে নালিশ করেন সে চটে যায়। শাস্তি দেবার মওকা খোঁজে। তাঁর মত অসহায় মানুষের কাউকেই চটালে চলে না। নিজেরই ক্ষতি তাতে। এটুকু সিতেশবাবু মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছেন এখন। তাই পারতপক্ষে কাউকেই কিছু বলেন না আর। নিজের অন্তরে হাঁতড়ে ফেরেন। কিসের যেন উত্তর খোঁজেন। কোন এক হিসাব মেলানোর প্রয়াসে স্মৃতির পাথার মন্থন করেন। দূর দিগন্তে কাদের মুখ ভেসে ওঠে। এদের মধ্যে দুটো মুখ বারে বারে সামনে আসে তাঁর। অবন্তিকা আর জয়শঙ্কর। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখা দু'টি মানুষ কি এক যোগসূত্র নিয়ে একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়। দু'চোখে নির্বাক প্রশ্ন, "মনে পড়ে?"

অবন্তিকা সান্যাল। বাবা পাটনা থেকে ভাগলপুরে বদলি হলেন যখন সেটা সিতেশবাবুর বি.কম. পরীক্ষার ফাইনাল ইয়ার। বাবার বন্ধু শিউপূজন মাথুরের বাড়ি সেই কটা মাস পেয়িং গেস্ট ছিল যুবক সিতেশ। ক্লাসমেট সমরেশের বোন অবন্তিকা। সমরেশ ও সিতেশ সমরেশের চিলেকোঠার ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতো। কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। ২ পরীক্ষা দিয়ে ভাগলপুরে যাবে সিতেশ। প্রায় সারাদিনই পড়াশোনা করতো দুই বন্ধু মিলে। অবন্তিকা চা আর মুখরোচক

খাবার বানিয়ে চিলেকোঠায় পৌঁছে দিয়ে আসতো নিয়মিত। ক্রমে সমরেশের নজর এড়িয়ে তার বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠলো সিতেশের।

পরীক্ষা শেষ হবার পর আরও কয়েক হপ্তা পাটনায় রয়ে গেল সিতেশ। বাবা-মা আপত্তি করেননি। পরীক্ষার খাটাখাটনির পর কিছুদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি আড্ডা, এটুকু ন্যায্য প্রাপ্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন তাঁরা। ভাগলপুরে সিতেশের চেনা-জানা কেউই নেই একেবারে। বাড়িতে বসে থেকে কি আর ছুটি উপভোগ করা যায়!

সিতেশ পাটনা ছাড়ার পর বাবা-মা'র সঙ্গে কলকাতায় মামাবাড়িতে ঘুরে এলো কিছুদিন। সেখান থেকে ভাগলপুরে ফিরে আসার অল্প ক'দিন পরেই রেজাল্ট বেরুলো। মোটামুটি ভালভাবেই পাস করেছে সে। সিতেশ ঠিক করলো এম.কম.টা বেনারস থেকে পড়বে। পাটনায় আর ফিরে যাবে না। তার এই সিদ্ধান্তে বাবা-মা অবাক হলেও বাধা দিলেন না। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-ডাক আছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে কোন অংশে কম নয়। পাটনায় পুরোনো পরিবেশ, চেনাজানা লোকজন, এটুকুই যা। তবে ছেলে নিজেই যখন বলছে তাঁদের তরফ থেকে আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না।

সিতেশের বাবা-মা আসল কারণটা জানতেন না। ইতিমধ্যে সমরেশ একবার ভাগলপুরে এসেছিল বোন অবন্তিকার বার্তাবহ হয়ে। অবন্তিকার চরম সর্বনাশের কথা সিতেশকে জানাতে। কিন্তু সিতেশ অবন্তিকার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা সরাসরি অস্বীকার করলো। সিতেশের অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সমরেশকে স্তম্ভিত বিহ্বল করে দিলো। আসলে সমরেশের মত ভদ্র মুখচোরা ছেলের পক্ষে এ কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। সিতেশকে চেপে ধরে দোষারোপ করা, তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার বাবা-মা'র কাছে তার কীর্তিকলাপ ফাঁস করার হুমকি দেওয়া - এরকম ক্ষেত্রে কার্যকরী কোন পদক্ষেপই নিতে পারলো না সমরেশ। মূক বেদনার পাষাণভার বুকে নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

অবন্তিকার শেষ অবধি কি হল সিতেশবাবু জানেন না। মেয়েটা আত্মঘাতী হল, না ওর বাবা বাড়ি ঘর বেচে বুড়ো-দোজবরে- পাগল- পঙ্গু কারো সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সমাজে মুখরক্ষা করলেন, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই সিতেশবাবুর। সিতেশ সেদিন সমরেশকে অপমান করেছিল। তার স্বৈরিণী বোনের

বোনের কলঙ্কের ডালি সিতেশের মত চরিত্রবান ছেলের ঘাড়ে চাপানোর হীন ষড়যন্ত্রের জন্য অকুণ্ঠ তিরস্কার করে বিদায় করেছিল। তারপর ক্ষণিকের জন্যও এ ঘটনাটা নিয়ে ভাবেনি কোনদিন।

এই ঘটনার স্মৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানোর মত মনোবল কোনদিনই আর সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি সিতেশবাবু। হৃদয়ের অতলে কোথাও একটা কাঁটা ফুটেছিল। সেটা রয়েই গেল চিরদিন। কাঁটাটাকে ঘিরে নতুন জীবকোষ গজিয়ে উঠে রক্তমাংসে ঢেকে দিয়েছে পুরোপুরি। শুধু ওই একটুখানি জায়গা একটু অন্যরকম হয়ে রইলো। বিকৃতি। হাঁ ওই অল্প বিকৃতিটুকু এড়ানো যায়নি। যখনই মনের গহনে চেয়ে দেখেন ওটা নজরে পড়ে। না দেখার ভান করেন কিন্তু না দেখেও পারেন না।

অন্য মুখখানা জয়শঙ্করের। বেনারসের বন্ধু। পড়াশোনা শেষ করে একই দপ্তরে কাজ পেয়েছিল দু'জনে। অগাধ বন্ধুত্ব। জয়শঙ্কর খুব বড় ঘরের ছেলে। শিক্ষা-দীক্ষা ধনে-মানে ওদের পরিবার স্বনামধন্য ও অঞ্চলে। জয়শঙ্কর ছেলেটিও যেন লাখে এক। হীরের টুকরো যাকে বলে। সিতেশবাবুর আগ্রহেই তাঁর খুড়তুতো বোন মণিকার সঙ্গে জয়শঙ্করের বিয়ের প্রস্তাব আসে এবং দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল কলকাতায়। বর-বধূ বেনারসে ফিরে যাবে এবার। সিতেশবাবুও ওদের সঙ্গে চলেছেন।

চলন্ত ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে গভীর রাতে সিতেশের ঘুম ভেঙে গেল। নাইট ল্যাম্পের স্বল্প আলোতে সিতেশ দেখলো দুটো লোক ঘাড় বেঁকিয়ে ওদের বার্থগুলো দেখতে দেখতে বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভেস্টিবুল ট্রেন। বাঁদিক ও ডানদিক দুদিকেই খোলা। ওই খোলা পথে অন্য বগীতে যাওয়া যায়। যাত্রীদের আসা যাওয়া সারা রাতই চলতে থাকে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে উঠতে হয়। আবার বড় স্টেশনে ট্রেন থামলে চা কফি খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেয় অনেকে, ট্রেনে যাদের সহজে ঘুম আসতে চায় না। এ ছাড়া নতুন যাত্রীর ট্রেনে ওঠা, পুরোনো যাত্রীর গন্তব্য স্থলে নেমে যাওয়া এ সব তো আছেই।

লোক দু'টোকে দেখে সিতেশের সারা শরীর মুহূর্তে হিম হয়ে গেল। এরা সাধারণ যাত্রী নয়। দু'জনেরই মুখের অনেকখানি অংশ কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং

চাল চলন অতি সন্দেহজনক। উপরের বার্থে শুয়েছিল সিতেশ। মাঝেরটায় জয়শঙ্কর এবং নীচেরটায় মণিকা। কামরার বাকি তিনটে বার্থে এক মধ্যবয়সী দম্পতি ও একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটিকে কলকাতা থেকে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির কাজকর্ম করবে বলে। সাধারণ মালপত্র, বেঞ্চের নীচে রাখা। এক পাশে জলের কুঁজো।

সিতেশদের এদিকটা দামী দামী মালপত্রে ঠাসা। দেখেই বোঝা যায় বিয়ে করে সালঙ্কারা কনে আর যৌতুক নিয়ে বর বাড়ি ফিরছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখে কাপড় বাঁধা লোকদুটির পরিচয় ও অভিসন্ধি নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সাঁশালো শিকারের সন্ধানে ট্রেনে ঢুকেছে। হয়তো এখনো ঠিকমত নিশ্চিত হতে পারেনি এই কামরাতেই কিনা ----। তবে ফিরে আসবেই। খুব শিগ্‌গির। হয়তো আরো সাকরেদ আছে, সবাই মিলে চড়াও করবে। সিতেশ আর কালক্ষেপ না করে নীচে নামলো। খুব সন্তর্পণে নামলো যাতে জয়শঙ্কর বা মণিকা জেগে না যায়। বাঙ্ক থেকে শালটা টেনে নিয়ে এলোমেলোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিলো। তারপর আধঘুমন্ত মানুষের মত টলমল ভঙ্গিতে ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে পড়লো। বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দরজায় পিঠ লাগিয়ে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করলো। পরপর তিনটে দেশলাই কাঠি পুড়িয়ে শেষ অবধি সিগারেট ধরানো গেল। ওর হাত তখন রীতিমত কাঁপছে। হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ যেন ট্রেনের চাকার আওয়াজকে ছাপিয়ে কানে বাজছে সিতেশের। সিতেশ বাথরুমেই রয়ে গেল এরপর। অনেকক্ষণ।

ইতিমধ্যে কম্‌পার্টমেন্টে হুলস্থূল বেধে গেল। দুর্বৃত্তরা মণিকার গয়না লুটে নিয়ে গেল। জয়শঙ্কর তাদের বাধা দিতে যাওয়ায় তাকে হত্যা করে জিনিসপত্র নিয়ে কোন বন-বাদাড়ে চেন টেনে দলবলসুদ্ধু নেমে পড়লো। পরে লোকজন এসে পড়ার পর সিতেশ বাথরুম থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। মৃত জয়শঙ্কর ও মূর্ছিতা মণিকাকে দেখে মাথায় করাঘাত করে কাঁদতে লাগলো, "হায় হায় এ কি সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি জানতেও পারলাম না।" প্রকৃত ঘটনা কোনদিন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি সিতেশবাবু এবং এ ব্যাপার নিয়ে তাঁর খুব একটা অনুশোচনা হয়নি। জয়শঙ্কর যে এত বোকা, বৌয়ের গয়নার চাইতে নিজের প্রাণটা যে ঢের বেশী মূল্যবান - বিপদের সময় অর্ধং ত্যাজতি পণ্ডিতঃ, য পলায়তি স জীবতি - এই সাধারণ কথাটা যে জানে না সেরকম মানুষের জন্যে আফসোস করা বৃথা। এই এতবছর ধরে ওই ঘটনা সম্বন্ধে কোনদিন গভীর ভাবে চিন্তা করেননি

সিতেশবাবু। অথচ ইদানীং জয়শঙ্করের সঙ্গ কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না আর। প্রতিনিয়ত ওর মুখখানা সামনে ভাসছে তাঁর।

আজকাল নানা অবান্তর কথা মনে হয় প্রায়ই। সেদিন ট্রেনে ডাকাতদের মোকাবিলা করতে গিয়ে উনিও যদি প্রাণ হারাতেন তবে সত্যিই কি এমন কিছু ক্ষতি হত তাঁর! জয়শঙ্কর হুইলচেয়ারে বসতে পেলো না। পঙ্গু হয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে রইলো না। আরও কত অসুন্দর অসুখী অবাঞ্ছনীয় জিনিস যে তার অভিজ্ঞতায় স্থান পেলো না, তাতে কি খুব বেশী বঞ্চিত হয়েছে জয়শঙ্কর?

ছাদের এদিক থেকে রাস্তাটা দেখা যায় না। এক তলায় কাপুরদের ফ্ল্যাটের পিছন দিকের খানিকটা দেখা যায় কেবল। রান্নাঘরের লাগোয়া এক ফালি জমি। অন্য ফ্ল্যাটগুলোয় এই এক রত্তি জমিতেই সুন্দর সব ফুল-পাতাবাহারের গাছ লাগিয়েছে, সাদা-মেটে-ছাইরঙা নুড়ি দিয়ে কতরকম ডিজাইন করেছে। সে তুলনায় কাপুরদের লনটা বেশ বড়ই বলতে হবে। তবে নামেই লন, আগাছায় ভরা। যেমন তেমন একটা বেড়া দেওয়া রয়েছে। লনে একটা পুরোনো চারপাই পড়ে আছে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম কস্মিন কালেও ওখান থেকে সরানো হয় না চারপাইখানা। ওর উপরে বিছানাপত্তর রোদে দেয় মাঝে মাঝে।

ওদের একটা প্রতিবন্ধী মেয়ে আছে। বছর ষোল সতেরো বয়স। মাঝে মাঝে অদ্ভুত আওয়াজ করে। পাড়া-প্রতিবেশীরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া পরিবারটির প্রতি ক্ষীণ একটা সহানুভূতি অনুভব করে সকলেই। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয় ওদের। একমাত্র সন্তান প্রতিবন্ধী। বাবা-মা চোখ বুজলে কি হবে কে জানে। বাবা সেলসম্যান। মা টিচার। একটা ঠিকে ঝি আছে। পাড়ার আরো কটা বাড়িতে কাজ করে স্ত্রীলোকটি। তার কাছে চাবি দেওয়া আছে। এক ফাঁকে এসে খাবার দিয়ে যায়। উঁকি দিয়ে দেখে যায় মাঝে মাঝে।

ওর অবস্থাও সিতেশবাবুর মতই আর কি! তবে হাঁটা চলা করতে পারে, সিতেশবাবুর মত হুইলচেয়ার-বদ্ধ নয়। নিজের দুর্দশাটা যেন আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন আজ। আহা, সামান্য দু'কদম দূরে যদি তাঁকে রেখে যেতো লছমী সারা দুপুরটা রাস্তার সীন-সীনারি দেখে কেটে যেতো। অতীতের স্মৃতিচারণে ক্ষতবিক্ষত হতে হত না তাঁকে। আজ পর পর তিন দিন রাস্তার

আড়ালে হুইলচেয়ার রেখে গেল মেয়েটা। সিতেশবাবু কত প্রতিবাদ করলেন, অনুনয় করলেন। লছমী হি হি করে হাসতে হাসতে চলে গেল। বলে গেল, "বুড়া দাদুর কথা বোঝে সাধ্যি কার।"

চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন সিতেশবাবু। কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি কোন সার নেই। আজ চার বছর হল রোগে পঙ্গু হয়ে আছেন। এখন বাকি শরীরটাও প্রায় নিস্পন্দ বলতে গেলে। সিতেশবাবু ঘুমোননি। চোখ বন্ধ করে স্মৃতির গভীরে ডুবে আছেন আত্মসমাহিত হয়ে।

হঠাৎ মনোযোগ খণ্ডিত হল। প্রতিবন্ধী মেয়েটা গোঁ গোঁ করে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছে। সাধারণত যেরকম আওয়াজ করে তার থেকে আরও অস্বাভাবিক। সিতেশবাবু নীচের আগাছাভরা লনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন চারপাইয়ের উপর মেয়েটা ও আরেকটা লোক। মেয়েটা উঠে পালাবার চেষ্টা করছে আর লোকটা তাকে সজোরে জাপটে ধরে বাধা দিচ্ছে। সিতেশবাবু তাঁর অবোধ্য স্বরে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সে চিৎকার কারো কানে পৌঁছলো না। সিতেশবাবু আশেপাশের বাড়ির ব্যালকনিতে জানলায় লোক দেখতে পাচ্ছেন। অদূরে রাস্তাতেও নিশ্চয়ই বহু লোক চলাচল করছে। অথচ সিতেশবাবুর চোখের সামনে যে পৈশাচিক ঘটনা ঘটছে তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকু তাঁর নেই। এই নিঃসীম অসহায়তা বড় অসহনীয় মনে হল তাঁর। আপ্রাণ চেষ্টায় সমগ্র উপরার্ধ দিয়ে হুইলচেয়ারটা সামনের দিকে ঠেলতে লাগলেন। কার্নিশ থেকে মাত্র কয়েক বিঘৎ দূরে ছিল হুইলচেয়ারটা। সিতেশবাবুর প্রবল চেষ্টায় সেটুকু দূরত্ব পেরিয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে সিতেশবাবুকে নিয়ে দোতলা থেকে সোজা একেবারে অকুস্থলে চারপাইয়ের পাশে এসে পড়লো। আর তক্ষুণি গেল গেল রবে চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো।

সিতেশবাবুর মরদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবার পথে দর্শনার্থীদের ভিড় পড়ে গেছিল। শববাহী গাড়ি ফুলে-মালায় ঠাসা। সবার মুখে সিতেশবাবুর জয়ধ্বনি শুধু। মৃতদেহ কি শুনতে পায়? হয়তো পায়। তা না হলে সিতেশবাবুর মুখখানা তৃপ্তির আলোয় অমন ঝলমল করবে কেন?